



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 821 - 828

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভাষা, জাতিসত্তা ও স্বীকৃতি : পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে রাজবংশী বিতর্কের সমাজ-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

মহম্মদ উজায়ির

গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি

Email ID : iammu000@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

North Bengal,
Rajbanshi language,
Rajbanshi identity,
language movement,
constitutional
recognition, ethnic
politics,
terminological
conflict,
administrative
response.

Abstract

এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে রাজবংশী ভাষা আন্দোলনের সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি, পরিভাষাগত বিভাজন এবং প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির পর কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকতা তৈরি হয়, তা-ই ভাষার মাধ্যমে আত্মপরিচয় পুনর্গঠনের এক অভ্যন্তরীণ তাগিদে পরিণত হয়েছে। ‘রাজবংশী’ ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবির মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন একটি বৃহত্তর জাতিসত্তা নির্মাণ এবং স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে। তবে ‘রাজবংশী’ ও ‘কামতাপুরী’র মধ্যে মতানৈক্য আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্ট করেছে এবং প্রশাসনিক স্বীকৃতির পথে বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ড ও ভাষা একাডেমি গঠনের মাধ্যমে প্রতীকী উদ্যোগ নিলেও, বাস্তব শিক্ষা-প্রশাসনে ভাষার অন্তর্ভুক্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০২০ সালে গঠিত ‘কামতাপুরী ভাষা একাডেমি’ও অনেকাংশে প্রতীকী মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এই ইস্যুতে সচেতন নীরবতা বজায় রেখেছে, যা আন্দোলনের অগ্রগতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রবন্ধে ভারতের অন্যান্য সফল ভাষা আন্দোলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে - যেমন তামিল, বোডো ও সাঁওতালি ভাষা আন্দোলন - যেগুলো সাংগঠনিক ঐক্য, সাহিত্যচর্চা ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তুলনায়, রাজবংশী আন্দোলনে নেতৃত্বের বিভক্তি, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং পরিভাষাগত দ্বিধা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। তবুও স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভাষার প্রচেষ্টা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সাহিত্যচর্চা, এবং সংস্কৃতিকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা একটি আত্ম-সচেতন ভাষা সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতে প্রশাসনিক স্বীকৃতির পথে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

Discussion

ভূমিকা : ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক চেতনা এবং আত্মপরিচয়ের প্রতীক। প্রতিটি ভাষার পেছনে থাকে একটি জাতিসত্তার স্মৃতি, সংগ্রাম এবং ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভাষা হয়ে ওঠে আত্মমর্যাদার প্রকাশ এবং রাষ্ট্রিক স্বীকৃতির জন্য লড়াইয়ের হাতিয়ার। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল যেটি সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত, বিশেষত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর ও সংলগ্ন আসামের অংশে বসবাসকারী কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা-পরিচয় ঘিরে যে দ্বন্দ্ব, তা শুধু একটি সাংস্কৃতিক বিতর্ক নয়; বরং এটি রাজনৈতিক অধিকার, সাংবিধানিক মর্যাদা এবং জাতিগত একত্বের প্রশ্নে এক গভীর দ্বিধার প্রতিফলন। বিশ্বের বহু অঞ্চলে ভাষা আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গেও ‘রাজবংশী’ পরিভাষাকে ঘিরে ভাষার স্বীকৃতি ও সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা চলেছে, যা দিনে দিনে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। রাজবংশীদের মতে, ‘রাজবংশী’ ভাষা কেবল আঞ্চলিক কথ্যরূপ নয়, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা, যার রয়েছে নিজস্ব ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য। এই ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তি এবং আলাদা শিক্ষাক্রম গঠনের দাবি সক্রিয়ভাবে সামনে আসে (Datta and Sengupta 103)।^১ তবে এই দাবির ভেতরেই এক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও নিহিত। কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এক অংশ ‘কামতাপুরী’ শব্দটিকে ভাষার নাম হিসেবে উপযুক্ত মনে করে। তুলনায়, রাজবংশী আন্দোলনে নেতৃত্বপক্ষ মনে করে যে, ‘রাজবংশী’ নামটিই ঐতিহাসিক জাতিগত পরিচয়ের ধারক এবং ‘কামতাপুরী’ শব্দটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত এবং বিভ্রান্তিকর। এই দ্বন্দ্ব কেবল পরিভাষাগত নয়, বরং জাতিসত্তা নির্মাণের দুই ভিন্ন ন্যারেটিভের সংঘর্ষ। যেখানে এক পক্ষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং দীর্ঘকালের ব্যবহার্য নামের পক্ষে, অন্যপক্ষ রাজনৈতিকভাবে দৃঢ়, জাতিসত্তাকে নতুন ভাষার মাধ্যমে রূপ দিতে চায়। ফলে ভাষা আন্দোলন হয়ে পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত এবং নেতৃত্বে বিভক্ত। প্রবন্ধটি এই দ্বন্দ্বকে ভাষাবিদ্যায়, সমাজতত্ত্বে এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশ্লেষণের চেষ্টা করবে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে - কেন একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাষাকে নিয়ে দ্বিধায় পড়ে? নামকরণ নিয়ে মতানৈক্য ভাষা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কী প্রভাব ফেলে? প্রশাসন ও রাষ্ট্র কীভাবে এই বিভাজনের প্রতি সাড়া দেয় বা উপেক্ষা করে? ‘ভাষা’ যখন পরিচয়, অধিকার এবং প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে, তখন সেই ভাষার রাজনৈতিক পরিণতি কী রূপ ধারণ করে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক সূত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সমাজ-ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনার পথে হাঁটবে।

রাজবংশী ভাষা দাবির উত্থান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : কোনো ভাষার স্বীকৃতির দাবি শুধু ধ্বনিবিজ্ঞান বা ব্যাকরণগত স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে ওঠে না; বরং সেটি গভীরভাবে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়। রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি চেষ্টা ঠিক এই বাস্তবতারই প্রতিফলন। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুরসহ সংলগ্ন আসামের ধুবড়ি ও কোকরাঝাড় অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা ও পরিচয় ঘিরে যে সাংগঠনিক বোধ তৈরি হয়েছে, তা ১৯৪৯ সালে কুচবিহার রাজ্যের ভারতের সঙ্গে একীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে দানা বাঁধে। এই সংযুক্তিকরণ বহু কোচ-রাজবংশী জনগণের মধ্যে একটি রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার মনোভাব জন্ম দেয়। পূর্বের রাজ্যিক কাঠামো বিলুপ্ত হওয়া, স্থানীয় ক্ষমতা হারানো, এবং বৃহত্তর বাংলা ও আসাম প্রশাসনের মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে মিশে যাওয়ার ফলে, তাদের আত্মপরিচয় সংকটের মুখে পড়ে (Sengupta 60)।^২ এই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকতা ধীরে ধীরে ভাষাভিত্তিক অধিকারের দিকে মোড় নেয়। রাজবংশীদের মতে, রাজবংশী ভাষা কেবল বাংলা বা আসামীয় ভাষার কোনো উপভাষা নয়; এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা, যার নিজস্ব ব্যাকরণ, ধ্বনিবিন্যাস, শব্দভাণ্ডার ও উচ্চারণরীতি রয়েছে। এই ভাষার ভিত্তিতে তারা তাদের রাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের প্রত্যয় ঘোষণা করে। এই দাবি আরোও জোরদার হয় একটি পৃথক রাজ্যের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে নামে। যদিও পৃথক রাজ্যের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে -এর কার্যকলাপ প্রশাসন কর্তৃক দমন করা হয়, তথাপি ভাষার সাংস্কৃতিক দাবি একটি জনপ্রতিষ্ঠিত চেতনা হিসেবে বেঁচে থাকে (Das 37)।^৩ রাজবংশী ভাষার পক্ষে যে ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি দেওয়া হয়, তা মূলত তার ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য, ক্রিয়া ব্যবহারের ভিন্নতা, এবং আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডারের ওপর দাঁড়িয়ে। Datta এবং

Sengupta তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এই ভাষায় কিছু স্বরধ্বনির উচ্চারণ বাংলা বা আসামীয় ভাষার তুলনায় ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, - ‘খাইসি’, ‘যাম’, ‘গেইলু ইত্যাদি শব্দ ও বাক্যরীতি বাংলা ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। এছাড়াও, এই ভাষায় ক্রিয়া রূপান্তরে যে পরিবর্তন হয়, যেমন— ‘আমি যাম’, ‘তুমি খাইসি’, তা অনেকটাই তাদের পূর্বতন সংস্কৃতির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে (Datta and Sengupta 105)^৪। তবে ভাষাতাত্ত্বিক মহলে এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়ে গেছে— এই বৈচিত্র্য কি একটি ভাষাকে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট? নাকি রাজবংশী একটি বাংলা ও আসামীয় মিশ্র উপভাষা মাত্র? ভাষাবিদদের একাংশ মনে করেন, ভাষার স্বীকৃতি কেবল ব্যাকরণগত পার্থক্য দেখিয়ে হয় না; বরং দরকার সামাজিক চর্চা, সাহিত্যিক ঐতিহ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার এবং জনসমর্থন। রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্যচর্চা এখনো সীমিত, যদিও কিছু নতুন প্রজন্মের কবি-লেখক, ইউটিউব চ্যানেল এবং গান-নাটকের মাধ্যমে ভাষা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ‘রাজবংশী’ শব্দটি নিজেই একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে - যার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে পৃথক ভাষাভাষী, এবং পরোক্ষভাবে একটি পৃথক জাতিসত্তার দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটি ‘ভাষা’কে ‘ভূখণ্ড’ ও ‘জাতি’ গঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে। ঠিক যেমন করে ভারতের বিভিন্ন ভাষিক জাতিগোষ্ঠী নিজেদের ভাষার মাধ্যমে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি তুলেছে (যেমন, মারাঠি, গুজরাটি, তেলুগু), তেমনি এই দাবিও একটি জাতিগঠনের রাজনীতির অনুসারী (Ray and Sharma 100)^৫। রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি দাবি কেবল সাংবিধানিক মর্যাদার জন্য নয়, বরং এটি একটি প্রান্তিক জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধার এবং রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এই দাবির পেছনে আছে ইতিহাসের চাপা ক্ষোভ, আত্মপরিচয় সংকট, এবং নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন। ভাষা এখানে কেবল উচ্চারণ নয়; এটি একটি রাজনৈতিক উচ্চারণ।

রাজবংশী’ বনাম ‘কামতাপুরী’ : পরিভাষাগত দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ সংঘাত : ভাষা আন্দোলনের সাফল্য কেবল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বা প্রশাসনিক সমর্থনের ওপর নির্ভর করে না; বরং তার স্থায়িত্ব ও সার্থকতা অনেকাংশে নির্ধারিত হয় অভ্যন্তরীণ ঐক্য, সাংগঠনিক সংহতি ও মতানৈক্য মোকাবিলার দক্ষতার উপর। রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি আন্দোলনের এক প্রাথমিক দুর্বলতা হল অভ্যন্তরীণ ঐক্যের অভাব। কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যেই দুইটি ভিন্ন পরিভাষার ব্যবহার - ‘রাজবংশী’ ও ‘কামতাপুরী’- এই দুর্বলতা এবং সাংগঠনিক বিভ্রান্তিকে প্রতিফলিত করে। ফলে একদিকে যেমন আন্দোলনের রাজনৈতিক বার্তা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, অন্যদিকে প্রশাসনের কাছেও ভাষাটি পরিচয়হীন ও বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

‘রাজবংশী’ শব্দটির ব্যবহার ঐতিহাসিক এবং জাতিগত পরিচয়ের ধারক। এই পরিভাষার সমর্থকেরা মনে করেন, রাজবংশী নামটির মাধ্যমে তাঁদের পূর্বপুরুষদের রাজ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক অবস্থান প্রতিফলিত হয়। ‘রাজবংশী’ পরিচয় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি নথি, জনগণনা ও সামাজিক পরিচয়পত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে এই নাম পরিবর্তনের অর্থ তাদের দৃষ্টিতে ইতিহাস ও ঐতিহ্য অস্বীকার করা। তাঁরা ‘রাজবংশী’ নামটিকে ভাষার পাশাপাশি জাতিসত্তার এক অখণ্ড প্রতীক হিসেবে দেখেন এবং ‘কামতাপুরী’ পরিভাষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করেন (Ray 44)^৬। অন্যদিকে, কামতাপুরী নামের পক্ষে থাকা অংশটি মনে করে - ‘রাজবংশী’ নামটি একধরনের ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও ঔপনিবেশিক শ্রেণিবিন্যাসের অংশ। তাঁদের মতে, এই নামটির মাধ্যমে একটি অভিজাত বর্ণের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের আত্মপরিচয় ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে পর্যাণ্ডভাবে উপস্থাপন করে না। ‘কামতাপুরী’ পরিভাষা তাঁদের কাছে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ - যার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে চান। এই শব্দটি তাঁদের মতে একটি মুক্তির প্রতীক, যা রাজ্যিক স্বাভাবিকতা, ভাষাগত স্বীকৃতি ও সাংবিধানিক অধিকার অর্জনের অভিপ্রায় বহন করে (Manohar 62)^৭।

এই দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের অভ্যন্তরে একটি স্পষ্ট বিভাজন তৈরি করেছে। ‘রাজবংশী কল্যাণ পরিষদ’, ‘রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ড’ প্রভৃতি সংগঠন ‘রাজবংশী’ ভাষার উন্নয়নের পক্ষে কাজ করেছে, অন্যদিকে ‘কামতাপুর পিপলস পার্টি’, ‘কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন’ এবং অন্যান্য সংগঠন ‘কামতাপুরী’ ভাষার স্বীকৃতি দাবি করেছে। এই সাংগঠনিক ভিন্নতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কৌশল নির্ধারণেও দ্বিধা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে এককভাবে কোনো দাবি সরকারের কাছে

সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যাচ্ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই বিভক্তির প্রভাব দৃশ্যমান। কিছু বিদ্যালয়ে 'রাজবংশী ভাষা' নামে পাইলট প্রজেক্ট চালু হয়েছে, আবার কিছু স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা 'কামতাপুরী' ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার মডিউল তৈরি করেছে। সাহিত্যচর্চা, গান, নাটক— সব ক্ষেত্রেই এই দুই পরিভাষার ব্যবহারে একটি দ্বৈততা বিদ্যমান। কিছু সাংস্কৃতিক ইউটিউব চ্যানেল 'Kamtapuri Song' বা 'Kamtapuri Natok' নামে সামগ্রী প্রচার করে, আবার কিছু প্ল্যাটফর্ম 'Rajbanshi Sahitya' নামে নিজেদের উপস্থাপন করে (Roy and Sharma 99)^৮। এই দ্বিধা নতুন প্রজন্মের মধ্যেও একধরনের পরিচয় সংকট তৈরি করেছে। প্রশাসনিক স্তরে এর প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্র যদি কোনো ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে চায়, তবে তাকে জানতে হয় - কোন ভাষা, কারা ব্যবহার করে, তার কী সাংগঠনিক ভিত্তি আছে, এবং কতটা জনসমর্থন রয়েছে। রাজবংশী ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অস্পষ্ট। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না। বরং তারা সাংস্কৃতিক তহবিল, উন্নয়ন বোর্ড, বা সীমিত অনুদানের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু মৌলিক স্বীকৃতির পথে এগোচ্ছে না। এই বিভক্তি কেবল প্রশাসনিক সমস্যা নয়, বরং এটি আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ যৌক্তিকতাকেই দুর্বল করে দেয়। ঐক্যহীনতা আন্দোলনের বার্তা অস্পষ্ট করে তোলে, গবেষণা ও নীতিগত দাবিকে বিভক্ত করে এবং সর্বোপরি নেতৃত্বহীনতা সৃষ্টি করে। একটি ভাষার স্বীকৃতি অর্জনের জন্য প্রয়োজন - সংগঠিত, সুপরিচালিত এবং সম্মিলিত চেতনার প্রকাশ। রাজবংশী ভাষা আন্দোলনে সেই চেতনার ঘাটতি এই পরিভাষাগত দ্বন্দ্বের কারণেই দৃশ্যমান। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব একটি সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। ভাষার নামে দ্বিধা থাকলে, শিক্ষার্থীরা কাকে ভিত্তি করে সাহিত্যচর্চা করবে? কোন নাম ব্যবহার করে গবেষণা করবে? এই প্রশ্নগুলো এক ধরনের সাংস্কৃতিক দিকভ্রান্তির সূচক, যা ভাষার স্থায়িত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য মারাত্মক বিপদ।

ভাষা ও স্বীকৃতি : সাংবিধানিক কাঠামো ও প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া : ভারতীয় সংবিধান বহুভাষিকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেও, ভাষাগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তা একেবারে নৈর্ব্যক্তিক বা সমতা-ভিত্তিক নয়। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে বর্তমানে ২২টি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কিছু ভাষা ঐতিহাসিকভাবে শাসকগোষ্ঠীর ভাষা, কিছু রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত গোষ্ঠীর দাবির ফল। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে শুধু সাংবিধানিক মর্যাদা পাওয়া নয়; বরং প্রশাসনিক, শিক্ষাগত ও আর্থিক সুবিধাও অর্জন করা। রাজবংশী ভাষা এখনো এই তালিকার বাইরে, এবং এ নিয়ে আন্দোলনরত জনগোষ্ঠী একপ্রকার সাংবিধানিক 'অনুপস্থিতির' অভিজ্ঞতা বহন করেছে। একটি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রচলিত কিছু শর্ত থাকে - যেমন ভাষার ব্যবহারে জনসংখ্যার অনুপাত, স্বতন্ত্র সাহিত্য ও ব্যাকরণ, প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা, জনসমর্থন ও রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা। রাজবংশী ভাষা দাবির পক্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের যুক্তি হলো - এই ভাষার নিজস্ব ধ্বনি, শব্দগঠন, ব্যাকরণ ও সাহিত্যচর্চা আছে; বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (Datta and Sengupta 106)^৯। কিন্তু রাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত এই দাবির পক্ষে কোনো নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ইস্যুতে দ্ব্যর্থপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছে। ২০০৩ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকার 'রাজবংশী' ভাষাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বিবেচনা করলেও, বাস্তবায়নের দিক থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি ভাষার পরিচয় নির্ধারণেও সরকার কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়নি - 'রাজবংশী' নাকি 'কামতাপুরী', এই প্রশ্নে সরকার নিরপেক্ষ থেকেছে, যা আন্দোলনের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। ২০১১ সালে রাজ্য সরকার একটি 'রাজবংশী উন্নয়ন ও সংস্কৃতি বোর্ড' গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার। বোর্ডটির মাধ্যমে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু এই বোর্ড একটি পরামর্শমূলক সংস্থা মাত্র; এর নেই কোনো নির্বাহী ক্ষমতা বা ভাষা নীতি নির্ধারণের সুযোগ। ফলত, ভাষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যবই প্রণয়ন কিংবা প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার - এই বিষয়ে বোর্ড কোনো বাস্তবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি (Roy and Sharma 98)^{১০}। এই সীমাবদ্ধতা ও আন্দোলনের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৮ সালে 'রাজবংশী ভাষা একাডেমি' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। একাডেমির উদ্দেশ্য ছিল রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতির গবেষণা, পাঠ্যসামগ্রী প্রণয়ন এবং সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত করা (Government of West

Bengal 2018)^{১১}। একাডেমির মাধ্যমে কিছু শব্দভান্ডার সংকলন, শিশুদের জন্য প্রাথমিক পাঠ্যবই এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। তবে, ‘রাজবংশী’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে আন্দোলনকারীদের একাংশ আপত্তি তোলে। তাঁদের মতে, এই নামকরণ ‘কামতাপুরী’ পরিচয়কে অস্বীকার করে এবং ভাষা-আন্দোলনের মূল দাবিকে খর্ব করে (Datta and Sengupta106)^{১২}। এই সমালোচনার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালে ‘কামতাপুরী ভাষা একাডেমি’ নামেও একটি পৃথক সংস্থা গঠন করে (The Telegraph 2020)^{১৩}। যদিও এই দুই একাডেমি সাংগঠনিক ভাবে পৃথক, বাস্তবে এদের কর্মকাণ্ডে কার্যকর সমন্বয় অনুপস্থিত। দুটিরই কাঠামো প্রতীকি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, এবং ভাষা শিক্ষার নীতিনির্ধারণ, শিক্ষক নিয়োগ কিংবা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির মতো মূল প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে এগুলোর কোনো বাস্তবিক ভূমিকা নেই। সমালোচকদের মতে, এই একাধিক একাডেমির সৃষ্টি আসলে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলনের ভিন্নমত দলগুলিকে খণ্ডিত করার এক কৌশল, যার ফলে ভাষাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বিভাজন আরও তীব্র হয়েছে (Manohar 65)^{১৪}। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর এ পর্যন্ত রাজবংশী ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যক্রম তৈরি করে বেশ কিছু রাজবংশী বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শুরু করেছে। এ ছাড়াও রাজ্যস্তরে কিছু সাংস্কৃতিক দল, এনজিও ও স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন রাজবংশী বা কামতাপুরী ভাষায় নাটক, গান ও শিশুদের শিক্ষাসামগ্রী তৈরি করেছে, কিন্তু এগুলো একান্তভাবে বেসরকারি উদ্যোগ। রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ বা উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের তরফে কোনো নীতিগত পদক্ষেপ এখনো গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান আরও অনির্দিষ্ট। মাঝে মাঝে সাংসদীয় প্রশ্নোত্তরে রাজবংশী ভাষা নিয়ে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্তির জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন বা প্রস্তাবপত্র আমলে নেওয়া হয়নি। অনেক আন্দোলনকারী মনে করেন, কেন্দ্র সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই দাবিকে এড়িয়ে চলছে, কারণ রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি মানেই পরোক্ষভাবে পৃথক রাজ্যের দাবিকে বৈধতা দেওয়া - যা রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক মনে করা হয় (Manohar 65)^{১৫}। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই একধরনের রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীরবতা বজায় রেখেছে।

এই বাস্তবতা রাজবংশী ভাষা আন্দোলনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির পথে এক অনিশ্চিত লড়াইয়ে ঠেলে দিয়েছে। ভাষাবিদদের গবেষণা, সাহিত্যচর্চা কিংবা সাংস্কৃতিক উৎসব - এগুলো যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা একা প্রশাসনিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে পারে না। দরকার রাজনৈতিক ঐক্য, সাংগঠনিক সংহতি এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে স্পষ্ট দাবি পেশ করার পরিকাঠামো। অথচ আন্দোলনের অভ্যন্তরে এখনো পরিভাষাগত দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের দ্বিধা ও সাংগঠনিক বিভাজন রয়ে গেছে। তবে কিছু ইতিবাচক দিকও লক্ষ করা যায়। কয়েকটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে রাজবংশী ভাষায় মৌলিক পাঠ্যসামগ্রী তৈরির চেষ্টা হয়েছে। কিছু অনলাইন পত্রিকা, যেমন ‘Kamtapuri Patrika’ বা ‘Rajbanshi Voice’, নিজস্ব ভাষায় লেখালেখি করেছে। এছাড়া কয়েকজন শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভান্ডার নিয়ে কাজ করছেন। যদিও এই প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন, তবুও তারা একটি সাংস্কৃতিক আত্মচেতনার বীজ বপন করেছে, যা ভবিষ্যতে প্রশাসনিক স্তরে প্রভাব ফেলতে পারে।

ভাষানীতি, নির্বাচনী রাজনীতি এবং রাজবংশী ভাষার প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ : ভারতবর্ষের ভাষানীতির ইতিহাস একটি জটিল ও বহুস্তরীয় প্রক্রিয়ার ফল। ১৯৫০-এর সংবিধানে ভাষাগত বহুত্বের স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও, বাস্তবে ভাষানীতির প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতা, সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপ এবং কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার সমীকরণের উপর নির্ভর করে। রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি প্রসঙ্গে এই নীতিগত অস্পষ্টতা ও প্রশাসনিক দ্বিধা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। একটি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া যেমন দীর্ঘ ও আমলাতান্ত্রিক, তেমনি তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও স্পর্শকাতর - বিশেষ করে যখন ভাষার দাবির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পৃথক রাজ্যের আন্দোলন।

রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি দাবি অনেকাংশেই যুক্ত হয়েছে পৃথক রাজ্যের দাবির সঙ্গে, যা প্রশাসনের কাছে এই ইস্যুকে নিরাপত্তা ও একতা রক্ষার দৃষ্টিকোণে রাজনৈতিকভাবে আপত্তিকর করে তোলে। কেন্দ্রীয় সরকার কখনোই সরাসরি এই দাবি নাকচ করেনি, আবার পূর্ণ সমর্থনও দেয়নি। মাঝে মাঝে সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এই ভাষার গুরুত্ব ও গবেষণার কথা উল্লেখ করা হলেও, অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কোনও কার্যকর কমিটি বা হোয়াইট পেপার প্রকাশ করা হয়নি।

এর অর্থ, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে দাবি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকে ধীরস্থ করে রেখেছে, যা একদিকে রাজনৈতিক অস্থিতি এড়ায়, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের ক্ষুব্ধ না করেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখে (Baruah 92)^{১৬}। রাজ্য সরকারের অবস্থান তুলনায় কিছুটা জটিল। ২০১১ সালের পর রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ভোটব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ‘রাজবংশী উন্নয়ন ও সংস্কৃতি বোর্ড’, ‘রাজবংশী ভাষা একাডেমি’ এবং পরবর্তীকালে ‘কামতাপুরী ভাষা একাডেমি’ গঠনের মাধ্যমে সরকার একদিকে আন্দোলনকারীদের প্রতীকী স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্যদিকে ভোটমুখী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দিকনির্দেশে কাজ করেছে (Ray and Sharma 108)^{১৭}। যদিও এগুলো ভাষানীতি নির্ধারণে বাস্তব ভূমিকা রাখেনি, তথাপি প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় আংশিক ভাষা কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে - যেমন কিছু গবেষণা প্রকল্প, স্থানীয় ভাষাভিত্তিক কর্মশালা এবং পাঠ্যসামগ্রী তৈরির প্রাথমিক প্রয়াস। তবে এসব উদ্যোগের অভ্যন্তরে একটি মৌলিক সমস্যা রয়ে গেছে - নীতিগত স্থায়িত্বের অভাব। রাজ্য স্তরে কোনো সুসংগঠিত ভাষা কমিশন বা পরিকল্পনা কাঠামো না থাকায়, একাডেমিগুলো কার্যত কর্মসূচিহীন থেকে যাচ্ছে। এদের বেশিরভাগই সংস্কৃতি দপ্তরের পরামর্শভিত্তিক প্রকল্প রূপে সীমাবদ্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে এ পর্যন্ত রাজবংশী ভাষায় প্রণীত পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও গাইডলাইন রাজ্য শিক্ষা দপ্তর প্রকাশ করেনি (Datta 2018)^{১৮}। অথচ বোডো ও সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে এই ধরনের কাঠামোগত অগ্রগতি স্বীকৃতির ভিত্তি তৈরি করেছে। নির্বাচনী রাজনীতির দিক থেকেও এটি একটি বিতর্কিত ক্ষেত্র। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে ভাষা-আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দিলেও, নির্বাচনের পর তা বিস্মৃত হয়।

তুলনামূলক প্রেক্ষাপট : ভারতের অন্যান্য ভাষা আন্দোলনের আলোকে রাজবংশী ভাষা আন্দোলন : ভাষা আন্দোলন কেবলমাত্র একটি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যম নয়, বরং তা একাধারে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, প্রশাসনিক প্রতিনিধিত্ব এবং জাতিগঠনের কৌশলের অংশ। ভারতের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এমন এক সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা, যেখানে ভাষা হয়ে উঠেছে আত্মপরিচয়ের প্রতীক এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদের হাতিয়ার। রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি দাবি সেই বৃহত্তর ভাষা আন্দোলনের ধারার মধ্যেই পড়ে, যদিও তার কাঠামো, শক্তি, দুর্বলতা এবং সংগঠনের দিক থেকে তা ভিন্ন। ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী ভাষা রাজনীতির প্রথম দৃঢ় প্রতিবাদ আসে দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষাভাষীদের কাছ থেকে। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দিকে জাতীয় ভাষা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুতে শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন, যেখানে ভাষার সঙ্গে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং প্রশাসনিক স্বাভাবিকতা দাবি যুক্ত হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ডিএমকে ও পরবর্তীতে এআইএডিএমকে - যারা তামিল ভাষার মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরোধিতা করে রাজ্যে শক্তিশালী আঞ্চলিক দল হয়ে ওঠে (Annamalai 2001)^{১৯}। এই আন্দোলনের সাফল্য ছিল রাজনৈতিক ঐক্য, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ব্যাপক জনসমর্থনের সম্মিলন। অন্যদিকে, পূর্ব ভারতে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আন্দোলন, বিশেষত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদ দিবসের প্রেক্ষাপট, ভাষার জন্য আত্মত্যাগ ও সাংবিধানিক সংগ্রামের ইতিহাসের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ভাষার অধিকার নিয়ে আন্দোলন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ‘মাতৃভাষা দিবস’ ঘোষণার পথ প্রশস্ত করে। এটি ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ ও আদর্শিক আন্দোলন - যেখানে ‘ভাষা মানে জাতি’ এই চিন্তাটি গভীরভাবে গেঁথে যায় সমাজে। ভারতের অভ্যন্তরে আরো কিছু ভাষা আন্দোলন সফল হয়েছে — যেমন বোডো, সাঁওতালি, ডোগরি, মৈথিলী, ইত্যাদি। বোডো ভাষা ২০০৩ সালে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্বীকৃতির পেছনে ছিল বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের নেতৃত্ব, ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার, পৃথক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দৃঢ় ভিত্তি। একইভাবে সাঁওতালি ভাষাও বিশিষ্ট লিপি (অলচিকি), সাহিত্য, গণচর্চা এবং সাংবিধানিক সমর্থনের ভিত্তিতে স্বীকৃতি লাভ করে। এইসব আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল - আন্তঃগোষ্ঠীগত ঐক্য, সাংগঠনিক স্থায়িত্ব এবং সরকারকে চাপ দিতে পারার ক্ষমতা। তুলনায়, রাজবংশী ভাষা আন্দোলনে এসব উপাদানের ঘাটতি বিদ্যমান। প্রথমত, আন্দোলনের অভ্যন্তরেই পরিভাষাগত বিভাজন রয়েছে - ‘রাজবংশী’ না ‘কামতাপুরী’ হবে, তা নিয়ে ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। এই বিভ্রান্তি আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। দ্বিতীয়ত, রাজবংশী ভাষার প্রচলন বহু অঞ্চলে থাকলেও তার শিক্ষাগত প্রয়োগ, সাহিত্যসংকলন, ও প্রাতিষ্ঠানিক গঠন এখনো সীমিত।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক স্তরে কোনো বড় দল এই ভাষা দাবিকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়নি; বরং অনেকেই এই দাবিকে ব্যবহার করেছে নিজেদের আঞ্চলিক ও নির্বাচনী স্বার্থে। তবুও রাজবংশী ভাষা আন্দোলনের একটি স্বতন্ত্র রয়েছে। এটি একাধারে ভাষার দাবি, ভূখণ্ডের দাবি এবং জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এর ফলে, রাজবংশী ভাষা কেবল একটি ভাষা স্বীকৃতির আন্দোলন নয়; বরং একটি আত্মপরিচয় পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা, যেখানে ভাষা হয়ে উঠেছে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীক। এই রকম বহুস্তরীয় দাবির কারণে আন্দোলন জটিল, কিন্তু একই সঙ্গে তা ভারতের জাতিগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

উপসংহার : রাজবংশী ভাষা আন্দোলন একটি ভাষার স্বীকৃতি চাওয়ার লড়াই মাত্র নয়, এটি এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। এই আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে - ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতা, সাংস্কৃতিক সংকট, প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং পরিভাষাগত দ্বন্দ্ব - একটি গভীর রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে ভাষা কেবলমাত্র উচ্চারণ বা ব্যাকরণের প্রশ্ন নয়; বরং তা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক, আত্মসম্মান এবং অধিকারবোধের প্রতীক। গবেষণায় দেখা যায়, কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ভাষাগত আন্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছে এক প্রকার সাংস্কৃতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক উপেক্ষা। ১৯৪৯ সালে কুচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির পর থেকে কোচ-রাজবংশীদের জাতিগত পরিচয় ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র্য ক্রমশ প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বিলীন হতে শুরু করে। এই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা, যার পরিণতি ঘটে ভাষা ভিত্তিক একটি পৃথক পরিচয় গঠনের মধ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজবংশী ভাষার দাবি একটি ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া, যেখানে ভাষা হয়ে ওঠে প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর। তবে এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও উপেক্ষণীয় নয়। ‘রাজবংশী’ ও ‘কামতাপুরী’ পরিভাষার মধ্যে চলমান বিতর্ক আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সংহতিকে দুর্বল করেছে। ভাষা স্বীকৃতির প্রশ্নে সাংগঠনিক ঐক্য অত্যন্ত জরুরি, যা আন্দোলনে বহু ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। একাধিক সংগঠন, ভিন্নমত, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক বিভাজন আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করেছে। ফলে আন্দোলন একটি গণসংগ্রামের চেয়ে অনেক সময় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের ভূমিকা এখানে সংকীর্ণ, কৌশলগত ও সুবিধাবাদী। রাজ্য সরকার ‘উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি দিলেও, ভাষার পাঠ্যক্রম বা প্রশাসনিক স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কেন্দ্র সরকার, আবার রাজনৈতিকভাবে এই দাবি এড়িয়ে চলেছে - পাছে এটি পৃথক রাজ্যের আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থান ভাষার প্রশ্নকে রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর করে তোলে এবং গণতান্ত্রিক স্বীকৃতির পথকে কঠিন করে তোলে।

Reference:

১. Datta, Dipankar, and Chaitali Sengupta. “Ethnic Conflicts in Urban Spaces: Contested Geographies of Koch-Rajbanshi Identity Politics in West Bengal and Assam.” *ResearchGate*, 2016, pp. 102–107
২. Sengupta, Manashi. *Uttarbanger Samajik O Rajnoitik Andolon (1911–1969)*. PhD dissertation, University of North Bengal, 2021, pp. 58–64
৩. Das, Kuntal. “The Kamtapur Movement and the Call for a Divided State in North Bengal.” *International Journal of Regional Politics*, vol. 12, no. 1, 2024, pp. 33–47
৪. Datta, Dipankar, and Chaitali Sengupta. “Ethnic Conflicts in Urban Spaces: Contested Geographies of Koch-Rajbanshi Identity Politics in West Bengal and Assam.” *ResearchGate*, 2016, pp. 102–107
৫. Ray, Sanjib, and Reena Sharma. “Negotiating Backwardness: Caste and Political Mobilization in North Bengal.” *Economic and Political Review*, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 95–110

୬. Ray, Sanjib. "Rajbanshi Identity Politics and the Quest for Recognition: A Study of Community Narratives." *Bengal Journal of Sociology*, vol. 10, no. 1, 2019, pp. 22–39
୭. Manohar, Swati. "Demands, Transgressions and Anomalies in the Kamtapur Struggle." *Journal of South Asian Political Analysis*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 55–70
୮. Ray, Sanjib, and Reena Sharma. "Negotiating Backwardness: Caste and Political Mobilization in North Bengal." *Economic and Political Review*, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 95–110
୯. Datta, Dipankar, and Chaitali Sengupta. "Ethnic Conflicts in Urban Spaces: Contested Geographies of Koch-Rajbanshi Identity Politics in West Bengal and Assam." *ResearchGate*, 2016, pp. 102–107
୧୦. Ray, Sanjib, and Reena Sharma. "Negotiating Backwardness: Caste and Political Mobilization in North Bengal." *Economic and Political Review*, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 95–110
୧୧. Government of West Bengal. *Rajbanshi Bhasha Academy Formation Order*. Department of Information & Cultural Affairs, 2018
୧୨. Datta, Dipankar, and Chaitali Sengupta. "Ethnic Conflicts in Urban Spaces: Contested Geographies of Koch-Rajbanshi Identity Politics in West Bengal and Assam." *ResearchGate*, 2016, pp. 102–107
୧୩. "The Kamtapuri Bhasha Academy Formed to Promote Regional Language." *The Telegraph*, Kolkata, July 2020
୧୪. Manohar, Swati. "Demands, Transgressions and Anomalies in the Kamtapur Struggle." *Journal of South Asian Political Analysis*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 55–70
୧୫. Manohar, Swati. "Demands, Transgressions and Anomalies in the Kamtapur Struggle." *Journal of South Asian Political Analysis*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 55–70
୧୬. Baruah, Sanjib. *Durable Disorder: Understanding the Politics of Northeast India*. Oxford University Press, 2005, pp. 88–104
୧୭. Ray, Sanjib, and Reena Sharma. "Negotiating Backwardness: Caste and Political Mobilization in North Bengal." *Economic and Political Review*, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 95–110
୧୮. Datta, Pranabkumar. "Kamatapur Andolon O Bhashar Proshno: Jatisattar Sandhane Uttarbongo." *Anchalik Rajniti O Samaj Gobeshona*, vol. 8, no. 2, 2018, pp. 41–58
୧୯. Annamalai, E. *Language Movements in Modern India: Conflicts and Accommodation*. Madras University Press, 2001, pp. 75–98